নিষ্কৃতি

স্নান সেরে ভিজে তোয়ালেটা বাইরে রোদে মেলতে এসে গীতা দেখলো সারদাম্মা তখনও বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে শুকনো মুখে গেটের পাশে বসে রয়েছে। ওর দেড় বছরের মেয়েটা মনের আনন্দে রাস্তার ধুলো মুঠো মুঠো তুলে গায়ে মাখছে। আর তার উপরের ভাইটা উদাস মুখে মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুল চুষছে। গীতাকে দেখে সারদাম্মা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো। গীতা অস্ফুট স্বরে আওয়াজ করলো একটা। তারপর ঘরে গিয়ে শাড়িটা পাল্টে ভিজে চুলগুলোকে জড়িয়ে একটা এলো খোঁপা বাঁধলো। রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করে বাইরে এসে সামনের দরজায় তালা দিলো। তারপর সারদাম্মার কাছে এসে বললো,"চলো, দেখি কি করতে পারি।"

সারদাম্মা ওর পিছন পিছন আসছে। বেশ খানিকটা তফাত রেখে। মাঝে মাঝে ওর গাঢ় সবুজ রঙের ছেঁড়া শাড়ির আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছে। কোলের বাচ্চাটা স্তনপানে বঞ্চিত হয়ে ক্ষীণ সুরে কঁকিয়ে চলেছে। গীতা মনে মনে ভাবলো সারদাম্মাকে বলবে ওকে একটা রবারের নিপল্ কিনে দিতে। তাহলে সারাক্ষণ বাচ্চার মুখে বুক গুঁজে থাকতে হবে না ওকে। তক্ষুনি মনে হল থাকগে, কাজ নেই বলে। রবারের নিপল্ চুষে বাচ্চা বাঁচে না। অবশ্য সারদাম্মার শুকনো বুক থেকেও আর বিশেষ কিছু পায় না বাচ্চাটা, একমাত্র মা'র উষ্ণ পরশ ছাড়া।

সারদাম্মা অশিক্ষিত হলেও নির্বোধ নয়। বাচ্চাটা যে বড় হবার বদলে দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছে সে-ও এটা লক্ষ্য করছে বেশ কিছুদিন থেকে। মনের মাঝেই আতঙ্কটা লুকিয়ে রেখেছিল প্রথমে। তারপর আর পারেনি। ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে হাজির হয়েছে। এক ছোকরা ডাক্তার ডিউটিতে ছিল তখন। সদ্য পাস করে কাজে ঢুকেছে। এখনও

সাংসারিক অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েনি মনে। বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করতে করতে ওর চোখ মুখের দ্রুত ভাব পরিবর্তন হতে লাগলো।

সারদাম্মার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বললো, "এ তো স্রেফ না খেতে পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। একি তোমার দুধ খায়?"

সারদাম্মা নীরবে মাথা হেলালো।

"তোমার বুকে দুধ আছে?"

সারদাম্মা কান্নাধরা গলায় বললো, "না।"

ডাক্তার তার সহকারীকে কিছু নির্দেশ দিয়ে সারদাম্মার দিকে এগিয়ে এলো। চোখের পাতা আঙুল নখ সবকিছু দেখলো।

তারপর বললো, "দুধ হবে কি, শরীরে তো রক্তই নেই তোমার। ছেলে মেয়ে ক'টা?"

"চারটে।"

"আর হয়নি?"

"আরও দুটো নেই।"

"এরপর আর বাচ্চা হলে বাঁচবে না তুমি। তোমার শরীরে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর এ বাচ্চাটাকেও বাঁচাতে হলে পেটভরে খেতে দিতে হবে। গোরুর দুধ দিও, ভাল করে জ্বাল দিয়ে। প্রথম ক'দিন দুধে সামান্য জল মেশাতে পারো। তারপর সয়ে গেলে তখন এমনি দুধই দেবে।"

সারদাম্মার জন্যে কিছু ভিটামিন ও আয়রন ট্যাবলেট লিখে দিল। প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে সারদাম্মা দরজার দিকে এগোতে যাবে এমন সময় ডাক্তারের নজর পড়লো বড় ছেলেটার দিকে। সঙ্গী হিসেবে এনেছিল তাকে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো, "এটা কে?"

"আমার বড় ছেলে। স্কুলে পড়ে। সাত বছর বয়েস।"

ছোকরা ডাক্তার তীক্ষ্ণ চোখে আপাদমস্তক দেখলো ছেলেটাকে।

তারপর বললো, "তোমার এ ছেলেটিও দারুণ অপুষ্টিতে ভুগছে। ছেলেকে পেটভরে খেতে দেবে। ওর গায়ে এই দাগগুলো অপুষ্টির লক্ষণ।

শরীরে রক্ত নেই। এখন থেকে যত্ন না নিলে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে।"

সারদাম্মা পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ওর মাথা ঝিমঝিম করছে। ওর স্বামী বীরাপ্পা হাসপাতালে আসার নাম করলে রেগে যায়। আজ ওকে লুকিয়ে এসেছিল। কি লাভ হ'ল এসে? ওর বাচ্চাগুলো যে কিসে ভুগছে তা মর্মে মর্মে বোঝে সে। দিনান্তের সামান্য আহার্যটুকু সেই তো ধরে দেয় ওদের সামনে। 'রাগি'র আটা সিদ্ধ এক দলা করে বরাদ্দ তাদের। তাই খেয়ে পেটের বাকি অংশটা জল দিয়ে ভরিয়ে ঘুমিয়ে পরে বাছারা তার। সারদাম্মার চোখে ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই। খিদের মুখে ওই এক দলা আটা সিদ্ধ পর্যাপ্ত নয় মোটেই। তার উপর তার বুকের দুধ খায় বাচ্চাটা। হয়তো খিদের জ্বালাতেই ঘুম আসে না তার। কিন্তু পেট নয়, ওর বুকের কাছে মোচড় দিয়ে ওঠে ব্যথায়। শুধু বড় ছেলেরই নয় অন্য দুটোরও সারা শরীরে ছাপ ছাপ দাগ। ওদেরও পাগুলো ঠিক তারই মত সরু আর বাঁকা।

মিসেস রাও বারান্দায় চেয়ারে বসে ছুরি দিয়ে সজনে ডাঁটা ছাড়াচ্ছিলেন। গীতাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন।

গীতা কুন্ঠিত স্বরে বললো, "আমি কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি আজ। আমার ঝি কবে থেকে ধরেছে স্কুলের আয়ার চাকরিটার জন্যে। ওর ছেলেমেয়েরা নাকি খেতে পায় না। তার উপর কোন ডাক্তার আবার কি সব বলে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।"

মিসেস রাও ম্লান হেসে বললেন, "হোয়্যার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস, ইট ইজ এ ফলি টু বি ওয়াইজ।"

তারপর সারদাম্মার দিকে চেয়ে বললেন, "তুই সারাদিন স্কুলে থাকলে তোর বাচ্চাগুলোকে দেখবে কে? বীরাপ্পা তো মদ খেয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে।

সারদাম্মা নত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

মিসেস রাও বলে চললেন, "তাছাড়া এ বাচ্চাটা তো বোধহয় পাঁচ ছ'মাসের হয়ে গেল। তার মানে শীগগির আর একটা আসবে পেটে, যদি ইতিমধ্যেই না এসে থাকে। তখন কি করে সামলাবি? স্কুলের নিয়মবাঁধা

কাজ, আম্মার বাড়ির ঠিকে কাজ নয় যে যখন খুশি ছুটি নিবি। মাইনে যেমন বেশী খাটনিও তেমনি। তুই কি করে পারবি এতগুলো বাচ্চাকাচ্চা আর শরীরের ওই অবস্থা নিয়ে?"

গীতা বললো, "ওর স্বামী নাকি রিক্সা চালায়? টাকা পয়সা দেয় না?"

সারদাম্মা বললো, "রিক্সা টেনে যা পায় সব শুঁড়িখানায় ঢেলে তবে বাড়ি ফেরে। যেদিন রোজগার কম হয় তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে আসে, বাড়ি এসেই মারধোর শুরু করে। যেদিন বেশী টাকা পায় আকন্ঠ মদ গিলে ভোম হয়ে বাড়ি ফেরে। সেদিন আর আমাদের মার খেতে হয় না, এইটুকুই যা লাভ। আমি দু'বাড়ি ঠিকে কাজ করে যা পাই তাই দিয়ে এতগুলো লোকের আহার জোটাতে হয়। আমরা আধপেট সিকিপেট খেলেও ওর পুরো খাবার চাই। তা না হলেই কিল-চড়-ঘুষি।"

মিসেস রাও মন্তব্য করলেন, "তার উপর আবার বছর বছর বাপ হওয়ার শখটুকু আছে।"

গীতা বললো, "সেটা কিন্তু ওরই দোষ। আমি গত বছরেই বলেছিলাম অপারেশন করিয়ে নে আর যাতে ছেলেপুলে না হয়। তখনও এ বাচ্চাটা পেটে আসেনি। তখন আমার কথা শুনলে আজ আর এ দুর্ভোগ হ'ত না। আরও দু'একটা বাড়িতে ঠিকে কাজ করে আরও কিছু টাকা রোজগার করতে পারতো।"

মিসেস রাওয়ের ঝি চন্দ্রাবতী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল।

হাসতে হাসতে বললো, "ও হরি, আম্মা বুঝি সে কথা শোনোনি? বছর তিনেক আগের ঘটনা। সারদাম্মা অপারেশন করিয়ে নেবে, এত ঘন ঘন মা হওয়া তার পছন্দ নয় কোন রকমে ওর মরদ টের পেয়েছিল কথাটা। কি বেদম মারটাই না মারলো। আমরা তো ভেবেছি মরেই গেল বুঝি বউটা। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল কতক্ষণ। শেষে বীরাপ্পা নিজের রিক্সাতে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল ওকে। চারদিন ছিল হাসপাতালে। সারদাম্মা নাকি মাস দেড়েকের পোয়াতি তখন, সেটা নষ্ট হয়ে গেল। আমরা কিন্তু টের পাইনি মোটে। কিরে, তুইও টের পাসনি নাকি যে তোর পেটে বাচ্চা?"

সারদাম্মা চুপ করে রইলো।

চন্দ্রাবতীকে দেখলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে গীতার। ঠোঁট দুটো পানের রসে ছোপানো। রঙচঙে বাহারে শাড়ি, আঁটসাট বডিস। বিনুনিতে একরাশ ফুল গুঁজেছে। গলায় কয়েক ছড়া পুঁতির মালা। গীতা শুনেছে চন্দ্রাবতী নাকি নষ্টচরিত্রা। এ কলোনিটার নতুন পত্তন হয়েছে। বড় বড় ইমারত উঠেছে চারিদিকে। অসংখ্য মজুর-মজুরানীর ভিড়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যেবেলা মেয়েগুলো কাঠকুটো জোগাড় করে কালিমাখা হাঁড়িতে রান্না চাপায়। বাচ্চারা ঘিরে ধরে মাকে, তাদের যত নালিশ ও বায়নাক্কা নিয়ে। পুরুষদের মধ্যে যারা পোষমানা, তারা অদূরে বসে জটলা করে, নীচু গলায় গল্পগুজব করে। মাঝে মাঝে নিজেদের ছেলেপুলের উদ্দেশে হাঁক পাড়ে। তারপর হাত নেড়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে আবার আড্ডায় মশগুল হয়ে যায়। যে পুরুষগুলো এখনও পোষ মানেনি, যাদের এখনও গৃহিণী জোটেনি অথবা যাদের পরিবার দূর গ্রামে রয়েছে তারা এসব ঘরোয়া বৈঠকের তোয়াক্কা করে না। খালি প্লট এবং অর্ধ সমাপ্ত বাড়িগুলো পেরিয়ে অন্য কিছুর আকর্ষণে বেরিয়ে পরে ওরা। এদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন সময়ে চন্দ্রাবতীর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছে। আশ্চর্য, মিসেস রাও এত বিচক্ষণ, এত ভাল। শুধু এই একটা ব্যাপারে ওঁর বিচার বুদ্ধিকে কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারে না গীতা। ভারি খারাপ লাগে তার।

মিসেস রাও চন্দ্রাবতীকে কি একটা কাজে বাইরে পাঠালেন। তারপর সারদাম্মাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন। স্কুলের পুরনো আয়া কাজ ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছে। পছন্দ মত পাচ্ছেন না কাউকেই। এ তল্লাটে বাড়ি তৈরীর হিড়িকে লোক পাওয়া দুষ্কর। জন মজুরের কাজকেই বেশী পছন্দ করে এরা। যে কজন কাজের খোঁজে এ পর্যন্ত এসেছে তাদের কাউকেই খুব একটা নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি মিসেস রাওয়ের। মিসেস রাও স্থানীয় লোক। সারাদাম্মাকে অনেক বছর ধরে দেখে আসছেন। মানুষটা বিশ্বাসী, পরিশ্রমী ও নরম প্রকৃতির। নার্সারী স্কুলের আয়ার পক্ষে শেষোক্ত গুণটিও দরকার। অন্যদিকে দোষের মধ্যে হল ওর ঘন ঘন মাতৃত্বের দায়। তবে উনি ওকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে যতদিন ঠিকমত কাজ করতে পারবে শুধু ততদিনই তার চাকরি বজায় থাকবে। কোনরকম শৈথিল্য, তা সে যতই অনিচ্ছাকৃত হোক না কেন, স্কুল কমিটি বরদাস্ত করবে না। মিসেস রাও শুধু স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, তার সর্বাধিকর্ত্রী নন। সারদাম্মাও মেনে নিয়েছে এ চুক্তি।

স্কুলের কাজে সে প্রাণ ঢেলে দেবে। এতটুকু খুঁত রাখবে না কোথাও। তার গোটা সংসারটাকে বাঁচানোর একমাত্র সুযোগ এটা, হয়তো বা অন্তিম সুযোগ।

চন্দ্রাবতী বাজার সেরে ফিরে এলো। মিসেস রাও ওকে নিজেদের ভাষায় কি সব বলে বিদায় করলেন। তারপর রান্নাঘর থেকে একটা ট্রে এনে সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। দু'টো প্লেটে চারটে করে ধূমায়িত ইড্‌লি, তার পাশে নারকোলের চাটনি, বাটিতে সাম্বার।

গীতাকে একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আরও ইড্‌লি আছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে একসঙ্গে আনলাম না।"

গীতা চামচ দিয়ে স্পঞ্জের মত নরম ইড্‌লির একটা টুকরো কেটে চাটনি লাগিয়ে মুখে দিল।

খেতে খেতে বললো, "অপূর্ব!"

দক্ষিণী রান্না ভীষণ ভাল লাগে তার।

সে অনেককে বলতে শুনেছে, "দক্ষিণী খাবারদাবারগুলো আবার খাদ্য নাকি? চিংড়ি মাছের মালাইকারী, দই-মাছ, বিরিয়ানি, মুর্গ মুসল্লমের সঙ্গে পাল্লা দেবে ভাপানো চালবাটা আর খানিকটা তেঁতুল গোলা জল?"

গীতা ওদের বোঝাতে পারে না যে অতি সাধারণ সুলভ জিনিসকে লোভনীয় করে তোলার মধ্যে কৃতিত্ব আলাদা। বেনারসী আর বাংলা তাঁতের শাড়ি যাচাই করার মাপকাঠি এক নয়।

"আমাদের মায়া কাটিয়ে চললে তাহলে?"

গীতা মিসেস রাওয়ের প্রশ্নের জবাবে হতাশাসূচক আওয়াজ করলো একটা।

তারপর বললো, "ও কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। রোজ বাইশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে স্কুল করতে আসা নাকি পাগলামী।"

মিসেস রাও সায় দিলেন, "সেটা উনি ঠিকই বলেছেন। জালাহালি কি আর এখানে? রোজ এতদূর আসা-যাওয়া করলে শরীর ভেঙে যাবে তোমার। তাছাড়া চাকরিটা যখন শখ করে সময় কাটানোর জন্যে নিয়েছিলে। ওখানে ক্যাম্পে নিশ্চয়ই কম্পানীর অভাব হবে না তোমার।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "আমরা ভীষণ মিস করবো তোমায়। বাচ্চারাও। জানো লোকে বলে যারা শখ করে টিচিং লাইনে আসে তারা নাকি কাজে মন দেয় না কারণ চাকরি বজায় রাখার তাগিদ নেই তাদের। আমি তো উল্টোটাই দেখে আসছি বরং। যে লাইনেই বলো, যারা শখ করে অর্থাৎ ভাল লাগে বলে ঢোকে তারাই ভাল করে কাজ করে - কাজ করে আনন্দ পায় বলে। যারা জীবিকার জন্যে এসেছে তাদের কাছে কাজটা উপলক্ষ শুধু।"

মিসেস রাওয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো গীতা। দেখে ওপাশের বড় বাড়িটার পিছনে সারদাম্মা আর চন্দ্রাবতী ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা বলছে। ভারি অবাক হল গীতা। সারদাম্মার আবার ওই মেয়েলোকটার সঙ্গে হঠাৎ এমন হলায়গলায় ভাব হল কি করে? নাকি ভাল মাইনের চাকরিটা সদ্য হস্তগত করে এতই আনন্দ উপচে পড়ছে যে পাত্র অপাত্র বোধও লোপ পেয়ে গেছে তার? ওদের দিকে না তাকিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল গীতা, চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কথা বলার অপ্রিয়তা এড়ানোর জন্য। সত্যি, স্ত্রীলোকটাকে কেমন যেন নোংরা নোংরা মনে হয় গীতার। অথচ সর্বদা ছিমছাম হয়ে সেজেগুজে থাকে। গায়ে একটা সুগন্ধি কিছু মাখে যেটা আরও অসহ্য লাগে, কি এক অপরিচ্ছন্নতার ইঙ্গিত বলে মনে হয় তার। অথচ সারদাম্মার পরনে আধময়লা শাড়ি, একমাথা রুক্ষ চুল। ওর কাছে গেলে একটা বুনো বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। সেটা ওর গায়ের গন্ধ না ওর বাচ্চার পেচ্ছাপের, মনে মনে কতদিন আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে গীতা। কিন্তু একদিনও গা ঘিনঘিন করেনি তার।

চন্দ্রাবতী আর সারদাম্মার মধ্যে আকাশ পাতাল, উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুর থেকেও দূরত্ব বেশী। আর আজ দিব্যি দুই সখীর মত নিরিবিলি কুজন করছে দুজনে। মিসেস রাওয়ের কাছে চন্দ্রাবতীর কথা কিছু কিছু শুনেছে গীতা। অন্য সূত্র ধরেও অনেক কথা কানে এসেছে তার। চন্দ্রাবতী বেলগাঁও থেকে এসেছে। আসলে ও মারাঠী। এখানে কয়েক বছর বাস করে এবং স্থানীয় প্রেমিকদের সংস্পর্শে এসে বেশবাসে প্রায় দক্ষিণী হয়ে উঠেছে এখন। বেলগাঁওয়ে এখনও নাকি ওর সাবেক স্বামী বিদ্যমান। বিয়ের আট বছরের মধ্যে যখন একটা সন্তান দিতে পারলো না চন্দ্রাবতী, ওর স্বামীর ঘরে দ্বিতীয়ার আবির্ভাব হল। বছর

ঘুরতেই ফুটফুটে ছেলে হল তার। আনকোরা নতুন স্ত্রী-পুত্র পেয়ে আনন্দে মশগুল স্বামী একটা বাড়তি বাঁজা মেয়েমানুষ পোষার অনাবশ্যক খরচ বইতে রাজী হল না আর। সেটা পুরোপুরি দ্বিতীয়ার প্ররোচনায় কিনা জানে না চন্দ্রাবতী। মোট কথা স্বামীর সংসার থেকে অন্ন উঠলো তার।

"আসলে ওর বুকের মাঝে নীড় বাঁধার স্বপ্ন। বহু পুরুষ এসেছে ওর জীবনে। ছেঁদো কথায় ভুলিয়ে কাজ সেরে সরে পড়েছে সবাই। ওর ঘরকন্নার ক্ষুধা মেটালো না কেউ। বোকা মেয়েটা এখনও মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ায় আর পরিণামে নতুন করে প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সংগ্রহ করে বারে বারে।" মিসেস রাওয়ের কাছেই শুনেছে গীতা যে এ খেলায় সম্মানই শুধু নয় গাঁটের পয়সাও খুইয়েছে মেয়েটা।

স্থায়ী বন্ধনের বিফল প্রচেষ্টায় ওর শরীরটা ছাড়াও বাজার থেকে এটা ওটা কিনে প্রায়ই ভেট দিতে হয় ভালবাসার জনকে। গীতা তবু মনের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মিসেস রাওয়ের বাড়ির অন্দরমহলে চন্দ্রাবতীর উপস্থিতি প্রতিবারেই রূঢ় আঘাত দিয়েছে ওর মধ্যবিত্ত শালীনতাবোধকে।

সারদাম্মা স্কুলের কাজে বহাল হল। গীতারা এর কিছুদিন পরেই ইন্দিরানগরের বাস তুলে দিয়ে জালাহালি চলে গেল। জালাহালিতে দু'বছরের মত ছিল ওরা। এর মধ্যে গীতার আর ইন্দিরানগরে আসা হয়ে ওঠেনি। ওর স্বামী রমেন অফিসের কাজে সময় পেতো না মোটে। ওরও ইচ্ছে হত না একা একা এত দূরে আসতে। অথচ এক সময় ও ভেবেছিল রোজ বাস ঠেঙিয়ে স্কুলে পড়াতে যাবে অতদূর থেকে। দু'বছরের মাথায় জোড়হাট বদলি হল রমেন। যাবার আগে গীতা পুরোনো পাড়ায় এলো সবাইকে বিদায় জানাতে। মিসেস রাওয়ের বাড়িতে এসে অবাক হয়ে দেখলো অন্য বাসিন্দা রয়েছে সেখানে। তাদের কাছেই শুনলো স্কুলের কোয়ার্টারে উঠে গেছেন ওঁরা।

দু'বছর আগে স্কুলের নতুন বিল্ডিং সবে শুরু হয়েছিল। খুব একটা দূর নয় এখান থেকে। হেঁটেই গেল গীতা। গেটের মধ্যে বড় দোতলা বাড়ি। কম্পাউণ্ডের এক পাশে একটু তফাতে ছোট আর একটা বাড়ি।

বুঝলো ওটাই হেডমিস্ট্রেসের কোয়ার্টার। মিসেস রাও গীতাকে দেখে ভীষণ খুশি হলেন। উনি ভেবেছিলেন গীতারা ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে চলেই গেছে বুঝি। আদর অপ্যায়নের পর ঘুরে ঘুরে নতুন বিল্ডিং দেখালেন। এই স্কুলটায় বছর দেড়েক কাজ করেছিল গীতা। স্কুলের উন্নতিতে ওর মন গর্ব ও তৃপ্তিতে ভরে উঠলো।

এরপর স্কুল বাড়ির পিছন দিকে এলো ওরা। পাঁচিলের পাশে ছোট্ট একটা ঘর। অ্যাসবেস্টসের নীচু ছাদ। ঘরের সামনে খানিকটা জায়গা টিন, কঞ্চি, চট ইত্যাদি পাঁচমিশালি সরঞ্জাম দিয়ে ঘিরে এবং ঢেকে আরেকটা ঘরের মত বানানো। একদিক সম্পূর্ণ খোলা। সেখানে তোলা উনোনে একটি মেয়েলোক রুটি সেঁকছে। কয়েকটা বাচ্চা থালায় করে রুটি তরকারী খাচ্ছে। এদের মধ্যে দু'জনের পরনে এই স্কুলেরই ইউনিফর্ম। চারটে বাচ্চারই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশবাস। এই আধময়লা শাড়ি পরা রুক্ষ উসকোখুসকো চুলওলা স্ত্রীলোকটিকে ওদের মা বলে মনে হচ্ছিল না গীতার। কাছে খাটিয়ায় একটা শুঁটকো মত লোক শুয়ে শুয়ে বিড়ি ফুঁকছিল আর স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে কি সব বলছিল। ভাষা না বুঝলেও মনে হল শ্রুতিমধুর কিছু নয়।

বড় ছেলে দুটো এদের দু'জনকে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

মিসেস রাও জিজ্ঞেস করলেন, "মা কোথায়?"

বড় ছেলেটা বললো, "মা আপারেডীপালয়মের ওদিকে গেছে বাচ্চাদের পৌঁছতে।"

স্ত্রীলোকটি উনোন থেকে তাওয়া নামিয়ে তাড়াতাড়ি ওদের কাছে এগিয়ে এলো। দড়ির খাটিয়ায় শোয়া লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দেখলো। তারপর ভারি অনিচ্ছাসহকারে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিড়িহীন হাতটা কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার জানিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। যাবার আগে রাগ রাগ চোখে তাকালো স্ত্রীলোকটির দিকে। বড় ছেলেটা বেশ সপ্রতিভ, হাসিখুশি। খাটিয়া খালি হতেই ঘর থেকে একটা শীতলপাটি এনে বিছিয়ে দিল তার উপর।

গীতার দিকে চেয়ে বললো, "বৈঠো আম্মা।"

মিসেস রাও আরাম করে জাঁকিয়ে বসে গীতাকে বললেন, "বোসো। এদের চিনতে পারছো?"

স্ত্রীলোকটি বিনীত হাসিমুখে চেয়ে আছে ওদের পানে।

গীতা একটু ইতস্তত করে কুন্ঠিত কন্ঠে বললো, "কই মনে পড়ছে না তো।"

তিন নম্বর বাচ্চাটা একমনে খেয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। শূন্য থালা থেকে মুখ তুলে কিছু বললো। স্ত্রীলোকটি ব্যস্ত হয়ে রুটি বানাতে বসলো। ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কথাবার্তাও চালিয়ে যেতে লাগলো। বড় ছেলেটা ওদের বসতে বলেই সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেছিল। ফিরে এলো এক হাতে একটা ঠোঙা আর অন্য হাতে শালপাতা ঢাকা ছোট একটা মাটির খুরি নিয়ে। ওর পিছন পিছন আর একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো।

গীতাকে দেখে আকর্ণ হেসে নমস্কার করে বললে, "তুমি কখন এলে আম্মা?"

সারদাম্মার পরনে ধোপদুরুস্ত শাড়ি, পায়ে চটি। আঁটসাঁট করে খোঁপা বাঁধা। একটু মোটা হয়েছে। সব মিলিয়ে বেশ ভারিক্কী দেখাচ্ছে। খানিকটা মাস্টারনী মাস্টারনী ভাব এসে গেছে ওর মধ্যে। অন্য স্ত্রীলোকটি আটা-লাগা হাতেই একটা ভাঙা মোড়া এনে সামনে রাখলো। গীতার দু'চোখে বিস্ময়ের ঘোর। এরা তাহলে সারদাম্মারই ছেলেমেয়ে। ঠিক, ওই লোকটাই তো সেই বীরাপ্পা। বীরাপ্পাকে আগে দু'চারবার দেখেছে গীতা, ভিন্ন পরিস্থিতিতে চিনতে পারেনি আজ। এই তেলচুকচুকে, ফর্সা জামাকাপড় পরা বাচ্চাগুলোর সঙ্গে দু'বছর আগের শীর্ণ, অর্ধনগ্ন শিশুদের কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পেলো না গীতা।

সারদাম্মা কৃতজ্ঞতার সুরে বলতে লাগলো, "তুমিই এই আম্মাকে বলে আমায় চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিলে। তোমাদের দয়া আমি জীবনে ভুলবো না আম্মা।"

গীতা হাসিমুখে বললো, "সে কথা থাক। তবে তুমি যে চাকরিটা বজায় রাখতে পেরেছ সে কৃতিত্ব তো তোমারই। আর তাহলে ছেলেপুলে হয়নি তোমার !"

সারদাম্মা সলজ্জ হাসি হেসে একটু তফাতে গিয়ে ওদের জলখাবার

গোছাতে লাগলো। ঘর থেকে পুরুষকন্ঠে চাপা তর্জন শোনা গেল।

মিসেস রাও জিজ্ঞেস করলেন, "কি, হয়েছে কি?"

অন্য স্ত্রীলোকটি নরম গলায় নালিশ জানালো, "চা দিতে দেরী করেছি তাতেই ওর রাগ হয়েছে। দোষের মধ্যে বলেছি বাচ্চাগুলোকে আগে খেতে দিই, খিদেয় ছটফট করছে ওরা। সারদাম্মা এলে একসঙ্গে সবার চা করবো।"

সারদাম্মা প্রশ্রয়ের সুরে বলে, "তা মানতে চায় না যখন, আগে ওর জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। নিত্য রাগারাগির কি দরকার ----?"

মিসেস রাও নীচু গলায় বললেন, "এ সেই চন্দ্রাবতী। আমার বাড়ি কাজ করতো, মনে পড়ে?"

সারদাম্মা প্লেটে করে বড়া আর চাটনি এনে দিলো। চন্দ্রাবতী চা আনলো। সবাইকে চা দিয়ে গীতার কাছে এসে দাঁড়ালো।

গীতাকে অগত্যা বলতে হল, "কেমন আছ চন্দ্রাবতী?"

চন্দ্রাবতী তার রুক্ষ চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে কৃতার্থ গলায় বললো, "ভাল আছি আম্মা।"

সারদাম্মা ওকে বললো, "যা এবার চা খেয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আয় ----।"

চন্দ্রাবতী দু'হাতে দু'গ্লাস চা নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। ঘর থেকে কথাবার্তার চাপা গুঞ্জন ভেসে আসতে লাগলো। বোঝা গেল ওখানে এখন মান-অভিমানের পালা চলছে। গীতার স্তম্ভিত আড়ষ্টতা ওরা লক্ষ্য করলো কিনা কে জানে। সারদাম্মার হাবভাবে কোনও বিকার নেই, মিসেস রাও-ও বড়া খেতে খেতে একথা-সেকথা বলে চললেন অনর্গল। ভদ্রমহিলার এই একটা বড় গুণ দেখেছে গীতা। যে কোন পরিস্থিতিতেই দারুণভাবে মানিয়ে নিতে পারেন নিজেকে ----।

খানিকবাদে উঠে দাঁড়ালো গীতা। আসার সময় ওর স্বামী রমেনের সঙ্গে এসেছিল। এইচ.এ.এল.এ কিছু কাজ ছিল তার। সে কাজটুকু সেরে জালাহালিতে ফিরে গেছে রমেন। গীতাকে অটোরিক্সা নিয়ে একা ফিরতে

হবে। কাজেই সন্ধ্যা হবার আগে ফেরা দরকার। মিসেস রাও গেট অবধি সঙ্গে এলেন। সারদাম্মাও এলো তার আড়াই বছরের ছেলেটার হাত ধরে। একটা অটোরিক্সা ডেকে উঠে বসলো গীতা। ইতিমধ্যে বার কয়েক বিদায় সম্ভাষণের আদানপ্রদান হয়ে গেছে।

রিক্সা থেকে গলা বাড়িয়ে গীতা বললো, "আচ্ছা চলি তাহলে।"

মিসেস রাও স্নেহভরা কন্ঠে বললেন, "মাঝে মাঝে চিঠি লিখে খোঁজখবর নিও। একেবারে ডুব মেরো না যেন !"

সারদাম্মা ছেলেকে কোলে নিয়ে বললো, "ভেলু, আম্মাকে টা টা করো। আম্মা রেলগাড়ি চড়ে কতদূরে চলে যাবে।" ভেলু মায়ের কাঁধে মুখ গুঁজে একটা নিটোল কালো হাত সামনে এগিয়ে দিলো।

গীতা বললো, "টা টা ভেলু।" তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো, "জালাহালি।"

অটোরিক্সা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চললো আর গীতা বসে বসে আজ বিকেলের সদ্য দেখে আসা ব্যাপারটার কথা ভাবতে লাগলো ভ্রূ কুঞ্চিত করে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই তার। হঠাৎ ড্রাইভারের প্রশ্নে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, "আব কিধার জানা মেমসাব?"

গীতা রাস্তার দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়ে বললো, "আরে এত ঘুরপথ দিয়ে এলে কেন? মালেশ্বরম হয়ে এলে অনেক তাড়াতাড়ি হত।"

ড্রাইভার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্বিকার কন্ঠে বললো, "মুঝে ক্যা পতা, আপনে তো কুছ কহা নহী।"

তার কথার যুক্তি আছে। গীতা জালাহালি যেতে চেয়েছিল, সেখানেই এনেছে সে। এ রাস্তা যদি গীতার পছন্দ নয় আগেই তার বলা উচিত ছিল সে কথা। ও তো ওর সামনে দিয়েই এসেছে। গীতা নিরুপায় হয়ে চুপ করে রইলো। খামোকা দু'টাকা বেশী মিটার উঠবে। নিজের উপর রাগ হল তার। চন্দ্রাবতী ভাল আছে, সারদাম্মা কৃতজ্ঞ। ওদের সংসারে কারও কোন ক্ষোভ আছে বলে মনে হল না। এমন কি মিসেস রাও পর্যন্ত অনাচারটা দিব্যি চোখ কান বুঁজে মেনে নিয়েছেন। আর ওদের জন্যে ভেবে মরছে কিনা শুধু গীতা। দূর হোক গে !

গীতা সীটের সামনে এগিয়ে বসে ড্রাইভারকে নিপুণভাবে নির্দেশ দিতে লাগলো।